...ত্রের তীব্র প্রদাহ ২
...ইডস পরীক্ষা কেন্দ্র ৭
বুকের দুধ শ্রেষ্ঠ পুঁজি ৮

ISSN 1021-2078

স্বাস্থ্য সংলাপ

ICDDR,B
CENTRE FOR HEALTH AND POPULATION RESEARCH

আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ

বর্ষ ৭ সংখ্যা ১ — শ্রাবণ ১৪০৫

মানসিক রোগ

মুহম্মদ মুজিবর রহমান

মানুষ সামাজিক জীব। তার চিন্তা করার ক্ষমতা আছে। সে নিজের এবং অপরের অতীত কার্যাবলী মনে রাখতে পারে। সে পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলি সম্পর্কে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সমস্যা বিশ্লেষণ এবং এর প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। ভবিষ্যত কর্মপন্থা সম্পর্কেও পরিকল্পনা করে রাখতে পারে। সে নিজে সুস্থ বা অসুস্থ কি না বুঝতে পারে। সে তার নিজের যৌন অনুভূতি, আচরণ ইত্যাদিও নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম। এসবের যেকোনো একটির অভাবে তার মানসিক সমস্যা তৈরি হয়েছে বা হতে যাচ্ছে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত স্বাস্থ্যের সংজ্ঞায় দৈহিক সুস্থতার পাশাপাশি সমানভাবে মানসিক সুস্থতার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। সাধারণ হিসেবে বলা হয়ে থাকে যে, প্রতি দশ জনের মধ্যে একজন কোনো না কোনো মানসিক ব্যাধিতে ভুগছেন। স্বাস্থ্যের এই গুরুত্বপূর্ণ দিকটিকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার উপাদান হিসেবে সংযোজন করা হয়েছে।

শরীরের প্রতিটি অঙ্গের বিশেষ বিশেষ কাজ রয়েছে, যেমন ফুসফুস শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য, পাকস্থলী ও ক্ষুদ্রঅন্ত্র খাদ্য পরিপাক বা হজম করার জন্য, হৃদপিন্ড রক্ত-সঞ্চালনের জন্য, পা চলা-ফেরার জন্য, চোখ দেখার জন্য, ইত্যাদি। তেমনি মস্তিষ্ক এমন একটি অঙ্গ যার একটি প্রধান কাজ হচ্ছে মনের সকল প্রকার চাহিদা পূরণ করা। মস্তিষ্ক (Brain) মাথার শক্ত খুলির মধ্যে অবস্থিত অত্যন্ত নরম বস্তু। এর ওজন প্রায় ১২৫০ গ্রামের মত এবং লক্ষ লক্ষ অতি সূক্ষ্ম কোষ, রক্তকণিকা ও আঁশজাতীয় বস্তু এর মধ্যে বিদ্যমান। এই সূক্ষ্ম কোষ একে অপরের সাথে সংযুক্ত। এই স্নায়ুরসের মাধ্যমে স্নায়বিক সংবাদ প্রবাহিত হয়। মস্তিষ্ক নিম্নোক্ত ৩টি অংশে বিভক্ত :

নিচের অংশ (Brain stem): মস্তিষ্কের এই অংশ প্রধানত শ্বাস-প্রশ্বাস, হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া, রক্তচাপ, ঘুম এবং জেগে-থাকা প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করে। এই অংশের কোনো ক্ষতি হলে মানুষ জ্ঞান হারিয়ে ফেলে, এমনকি মারাও যায়।

মধ্য বা কেন্দ্রীয় অংশ (Limbic system): মস্তিষ্কের এই অংশ মানুষের ভাবাবেগ, আনন্দ, ভীতি, ক্রোধ, উদ্বেগ ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করা ছাড়াও মানুষের অন্যান্য জৈবিক চাহিদা যেমন ক্ষুধা, তৃষ্ণা এবং যৌনক্ষমতা পরিচালিত করে।

উপরের অংশ (Cortex): মস্তিষ্কের এই উন্নত ও সূক্ষ্ম অংশ দ্বারা মানুষের কথা বলার শক্তি, চিন্তা-চেতনা, বিচার-বিবেচনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, স্মরণ শক্তি ও সামাজিক আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয়।

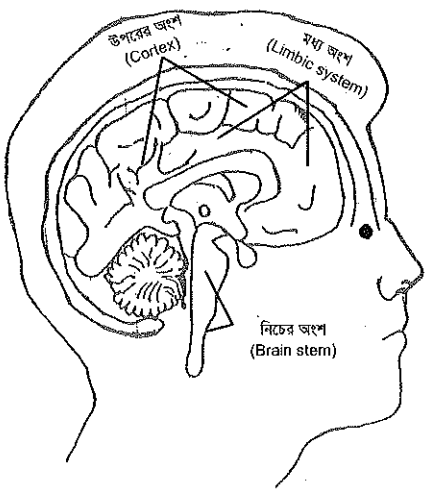

মস্তিষ্কের গঠন প্রক্রিয়া মাতৃগর্ভে ভ্রূণের ৪ সপ্তাহ বয়স থেকেই শুরু হয় এবং জন্মগ্রহণের পর দু'বছরের মধ্যে প্রায় সম্পূর্ণ পরিণতি লাভ করে। গর্ভবতী মা'কে পুষ্টিকর খাবার খাওয়ালে এবং দু'বছর বয়স পর্যন্ত শিশুকে পরিমিত পরিমাণ খাবার খাওয়ানো

(৩-এর পাতায় দেখুন)

পাঠকদের প্রতি

এখন থেকে স্বাস্থ্য সংলাপ-এর প্রতিবছরের তিনটি সংখ্যা শ্রাবণ, অগ্রহায়ণ এবং চৈত্র সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হবে

শিশুদের শ্বাসতন্ত্রের তীব্র প্রদাহ

ডাঃ নীহার রঞ্জন সরকার

সারাবিশ্বে বর্তমানে ৫ বৎসরের কম-বয়স্ক শিশুদের মৃত্যুর একটি অন্যতম কারণ হলো শ্বাসতন্ত্রের তীব্র প্রদাহ (Acute Respiratory Infection)। অধিকাংশ মৃত্যুই ঘটে নিউমোনিয়ার কারণে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৯০ সালে বিশ্বের ১২.৯ মিলিয়ন অনুর্ধ পাঁচ বছর বয়সের শিশুদের মৃত্যুর মধ্যে ৪.৩ মিলিয়ন ছিল শ্বাসতন্ত্রের প্রদাহজনিত। এর মধ্যে শতকরা ৭.৮ ভাগ মৃত্যুই ঘটেছে বাংলাদেশে। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় ১ লক্ষ ৪০ হাজার শিশু এ-রোগে মারা যায়।

শ্বাসতন্ত্রের প্রদাহের কারণ

নাকের গহ্বর থেকে শুরু করে শ্বাসনালী ও ফুঁসফুসদ্বয় নিয়ে শ্বাসতন্ত্র গঠিত। নিম্নোক্ত কারণে শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ হতে পারে।

- ব্যাকটেরিয়াজনিত (সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ)
- ভাইরাসজনিত
- ছত্রাকজনিত
- এলার্জিজনিত

শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণের প্রকার ভেদ ও বাংলাদেশে শিশুদের ওপর এর প্রভাব

শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণকে সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করা যায়:

ক. শ্বাসতন্ত্রের উপরিভাগের সংক্রমণ (Upper Respiratory Infection) যা নাকের গহ্বর থেকে শুরু করে কণ্ঠ পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে।

খ. শ্বাসতন্ত্রের নিম্নভাগের সংক্রমণ (Lower Respiratory Infection) যা কণ্ঠ থেকে শুরু করে ফুসফুসের নিম্নভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে।

শিশুরা শ্বাসতন্ত্রের নিম্নভাগ অপেক্ষা উপরিভাগের সংক্রমণে বেশি আক্রান্ত হয়।

আইসিডিডিআর,বি-পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা গেছে: শিশুদের শ্বাসতন্ত্রের প্রদাহের ৯৬ শতাংশই ঘটে থাকে শ্বাসতন্ত্রের উপরিভাগে এবং মাত্র ৪ শতাংশ নিম্নভাগে। আরও দেখা গেছে: ৬ মাসের কম-বয়স্ক শিশুরাই বেশির ভাগ শ্বাসতন্ত্রের তীব্র প্রদাহে ভুগছে।

নিউমোনিয়া

বিভিন্ন কারণে নিউমোনিয়া হতে পারে। ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস কিংবা ছত্রাক ইত্যাদি দ্বারা আক্রান্ত হলে নিউমোনিয়া হতে পারে। নিউমোনিয়ায় যত শিশু মারা যায় তার তিন-চতুর্থাংশই ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগে আক্রান্ত।

লক্ষণ ও উপসর্গ

নিউমোনিয়ার কারণ ভিন্ন হলেও লক্ষণ ও উপসর্গ প্রায় একই রকম। লক্ষণ ও উপসর্গ ধীরে ধীরে দেখা দিতে পারে অথবা হঠাৎ করেও শুরু হতে পারে। কাশি, অধিক জ্বর ও শ্বাসকষ্ট – এই তিনটি নিউমোনিয়ার প্রধান উপসর্গ।

নিউমোনিয়া নিরুপণের জন্যে নিম্নবর্ণিত কয়েকটি লক্ষণ দেখা বাঞ্ছনীয়:

- শিশু ঘন ঘন কাশতে থাকে
- তাপমাত্রা দ্রুত বেড়ে যায় (৩৭.৮ ডিগ্রী সেঃ-এর অধিক)
- শিশুর শ্বাস নিতে কষ্ট হয়
- শিশু দ্রুত শ্বাস নেয় (২ মাসের কম-বয়সের শিশুদের বেলায় মিনিটে ৬০ এর উপর, ২ থেকে ১২ মাস বয়সের শিশুদের বেলায় মিনিটে ৫০ এর উপর এবং ১ বৎসর থেকে ৫ বৎসর বয়সের শিশুদের বেলায় মিনিটে ৪০ এর উপর
- শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে সাথে বুকের নিচের অংশ দেবে যেতে পারে
- ফুসফুসে স্টেথোস্কোপ দিয়ে ঘর-ঘর শব্দ শোনা যায় এবং বুকের এক্সরে-তে অস্বাভাবিকতা দেখা যায়

নিউমোনিয়ায় ফুসফুসের পরিবর্তন

ফুসফুস অসংখ্য এ্যালভিওলাই দ্বারা গঠিত। এগুলো দেখতে অনেকটা আংগুরের গুচ্ছের মতো। এসব এ্যালভিওলাই বায়ু দ্বারা পূর্ণ থাকে। স্বাভাবিক অবস্থায় ফুসফুস বায়ু থেকে অক্সিজেন নিয়ে

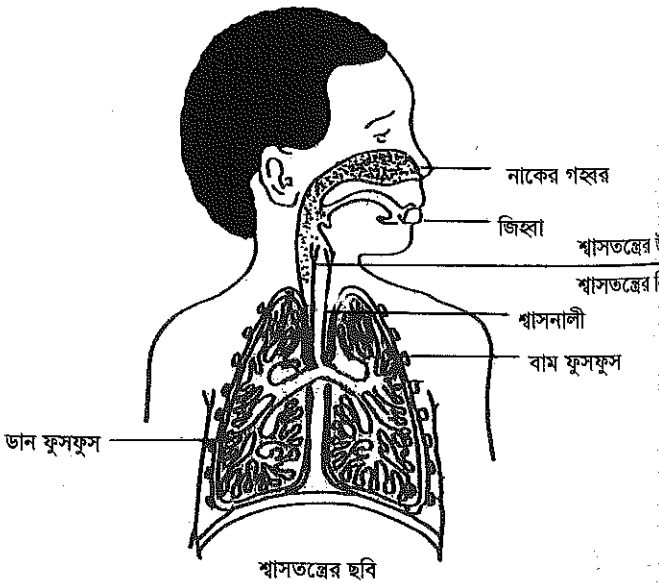

শ্বাসতন্ত্রের ছবি

এ্যালভিওলাইয়ের মাধ্যমে রক্তে সরবরাহ করে ও রক্ত থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড নিয়ে প্রশ্বাসের সাথে দেহ থেকে বের করে দেয়। জীবের মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে। নিউমোনিয়া হলে এ্যালভিওলাই-এর প্রদাহের ফলে এর দেয়ালে ও ভিতরে রস জমে যায়। ফলে রক্তের সাথে অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইড আদান-প্রদানে বিঘ্ন ঘটে।

চিকিৎসা

নিউমোনিয়ার কারণ এবং লক্ষণ অনুযায়ী এর চিকিৎসাও ভিন্ন ভিন্ন। শিশুর যদি কাশি, জ্বর ও শ্বাসকষ্টের সাথে দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস চলে এবং এর সাথে বুকের নিচের অংশ দেবে যায় তবে হাসপাতালে ভর্তি করে অক্সিজেনসহ ইনজেক্সশনের মাধ্যমে ওষুধ প্রয়োগ করে চিকিৎসা করা বাঞ্ছনীয়। শিশুর যদি দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যা না থাকে তাহলে শিশুর দেহের প্রতি কেজি ওজনের জন্য ১০ মিলিগ্রাম কট্রিমোক্সাজল ১২ ঘন্টা পর পর ৭ থেকে ১০ দিন অথবা ৪০-৫০ মিলিগ্রাম এ্যামোক্সিলিন ৮ ঘন্টা পর পর ৭ থেকে ১০ দিন দেওয়া যেতে পারে। তবে ওষুধ দেওয়ার ২ দিন পরও যদি রোগ না কমে তবে হাসপাতালে প্রেরণ করা শ্রেয়।

প্রতিরোধ

নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর ব্যাপারে সজাগ থাকলে শিশুদের নিউমোনিয়া প্রতিরোধ করা যেতে পারে:

১. যে শিশুরা বুকের দুধ খায় তারা সাধারণত নিউমোনিয়ায় কম ভোগে। ফলে শিশুদের সঠিকভাবে বুকের দুধ খাওয়াতে হবে।

২. স্বাভাবিকের চেয়ে কম জন্ম-ওজন (LBW) প্রতিরোধ করতে হবে, কারণ কম জন্ম-ওজনের (২.৫ কেজি) শিশুরা ঘন ঘন শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণে ভোগে। গর্ভবতী মায়েদের পুষ্টি নিশ্চিত করলে শিশুর জন্ম-ওজন স্বাভাবিক হবে।

৩. যে শিশুরা অপুষ্টিতে ভোগে বা ভিটামিনের, বিশেষ করে ভিটামিন 'এ' এবং অন্যান্য অনুখাদ্যের অভাবে ভোগে, তারা প্রায়ই নিউমোনিয়াসহ অন্যান্য সংক্রামক রোগ, যেমন ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়। ফলে শিশুরা যাতে অপুষ্টিতে এবং ভিটামিন ও অন্যান্য অনুখাদ্যের অভাবজনিত জটিলতায় না ভোগে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

৪. সর্বোপরি শিশুদের পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ও খোলামেলা পরিবেশে রাখতে হবে।

৫. হামের জটিলতা হিসেবে নিউমোনিয়া দেখা দিতে পারে। সময়মতো হামের টিকা নিলে অন্তত হামজনিত নিউমোনিয়া থেকে শিশুকে রক্ষা করা সম্ভব।

উপসংহার

আশার কথা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্বাসতন্ত্রের প্রদাহ-জনিত শিশুমৃত্যু রোধে এআরআই (ARI) প্রকল্প হাতে নিয়েছে এবং বিগত কয়েক বছর ধরে কাজ করে যাচ্ছে। এই অনুন্নত বিশাল জনসংখ্যা-অধ্যুষিত বাংলাদেশে সরকারের একার পক্ষে এত শিশুর মৃত্যুরোধ করা সম্ভব নয় যদি সচেতনভাবে জনগণ এগিয়ে না আসে।

মানসিক রোগ

(১ম পাতার পর)

হলে মস্তিষ্ক পরিপূর্ণ রূপ লাভ করে। শিশুর বাড়ন্ত বয়স পর্যন্ত পারিপার্শ্বিক পরিবেশ শিশুর শরীর ও মন গঠনের উপযুক্ত হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন।

সাধারণ মানুষের ধারণা: অশুভ আত্মা, জ্বীন-পরীর আছর, ভূতে-ধরা, যাদু-টোনা এবং ভাগ্যের নির্মম পরিহাস হচ্ছে মানসিক রোগের কারণ। আবার অনেকেই বিশ্বাস করেন: পিতা-মাতার মানসিক রোগ থাকলে তার সন্তানদেরও অবশ্যই মানসিক রোগ হবে – যা মোটেই সত্যি নয়। বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে: মাত্র শতকরা ১০ ভাগ মানসিক রোগীর পিতা-মাতার মানসিক রোগের ইতিহাস রয়েছে। মানসিক রোগ দূর করার জন্য ওঝা দেখানো, ঝাড়ফুঁক, পানি-পড়া, তাবিজ দেওয়া বা হাতুরে-ডাক্তার দেখানো প্রভৃতি কুসংস্কারপূর্ণ কাজ করা হয়ে থাকে। এতে ভালোর চাইতে খারাপই হয়ে থাকে।

প্রায় মানুষই বিভিন্ন কারণে কোনো না কোনো সময় ভাবাবেগে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। কখনো দুঃখ-ভারাক্রান্ত হয়ে, কখনো উৎকণ্ঠায়, কখনো বা রাগান্বিত ও হঠকারী হয়ে বেসামাল কাজ করে ফেলে। এগুলো দীর্ঘস্থায়ী হয় না এবং দৈনান্দিন জীবন-যাত্রা এই সমস্ত ভাবাবেগ দ্বারা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। ফলে, এগুলো অস্বাভাবিক আচরণের মধ্যে পড়ে না। সাধারণত এসব আচরণকে 'মুড অফ' বা 'লুজিং টেম্পার' বলে মনে করা হয় বা ধরে নেওয়া হয়।

মানসিক রোগের শ্রেণী বিভাগ

মানসিক রোগ নানা প্রকার। তবে রোগের প্রকৃতি অনুযায়ী 'গুরুতর' এবং 'লঘু' – এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। এছাড়া আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ মানসিক রোগ রয়েছে।

গুরুতর মানসিক রোগ (Psychosis)

গুরুতর মানসিক রোগসমূহের মধ্যে রয়েছে: (১) শিজোফ্রেনিয়া বা অসংলগ্নতা বা বিকারগ্রস্ততা (২) উন্মত্ততা (৩) আবেগজনিত দ্বি-প্রান্তিক ব্যাধি (৪) বিষণ্নতা (৫) বুদ্ধিবৈকল্য বা চিত্তভ্রংশ।

শিজোফ্রেনিয়া বা অসংলগ্ন মানসিকতা (Schizophrenia)

শিজোফ্রেনিয়া-আক্রান্ত রোগীকে আমাদের সমাজে ঘোরতর পাগল বলে আখ্যায়িত করা হয়। এটি এমন একটি মানসিক সমস্যা যা ব্যক্তির ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের অবনতি ঘটায় এবং বিনাচিকিৎসায় দীর্ঘকাল থাকলে মানসিক অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকে। শিজোফ্রেনিয়া সাধারণত ১৫ থেকে ২৫ বৎসর বয়স থেকেই শুরু হয়। শিজোফ্রেনিয়া রোগীদের অলীক চিন্তা-ধারণা ও কিছু বদ্ধমূল ভ্রান্ত ধারণা জন্মায় যা শত চেষ্টা করেও সংশোধন করা যায় না। সে অনেক জিনিস প্রত্যক্ষ করে এবং কানে শুনতে পায় যার কোনো বাহ্যিক অস্তিত্ব নেই। এই সমস্ত কারণের জন্য তার কথাবার্তা, চাল-চলন বোধগম্য হয় না এবং খাপছাড়া মনে হয়। মাঝেমধ্যে কম কথা বলে, আবার কখনো বা বেশি কথা বলে, অকারণে হাসে ও কাঁদে। অনেক রোগী আছে যারা বিনা কারণে অতি চঞ্চল ও কর্মব্যস্ত থাকে। হঠাৎ করে ভয়ংকর আচরণ শুরু করে। অন্যের উপর আক্রমণ করে বসে। এই সমস্ত অস্থিরতা, নির্বাক আচরণ এবং অদ্ভুত শারীরিক ভঙ্গিমার সাথে সাথে নিদ্রাহীনতা বিরাজ করে। অধুনা মস্তিষ্কের স্নায়ুতন্ত্রের ডোপামিন সিস্টেমের অতিস্পর্শকাতরতাকে এই রোগের প্রধান কারণ বলে মনে করা হয়। বিজ্ঞান-ভিত্তিক চিকিৎসার মাধ্যমে শিজোফ্রেনিয়া রোগীকে সম্পূর্ণ সুস্থ করা সম্ভব।

উন্মত্ততা (Mania)

(ক) হর্ষোন্মত্ততা (Manic episode): এই ধরনের রোগীকে অস্বাভাবিক উৎফুল্ল দেখা যায় এবং রোগী নিজেও তা বলে থাকে। অতিরিক্ত কথা বলা এবং কথা বলার সময় ঘন ঘন এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে চলে যাওয়া এ-রোগের প্রধান লক্ষণ। তবে বিষয়বস্তুগুলোর মধ্যে খুব সামান্য হলেও একটা যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। রোগী নিদ্রাহীনতায় ভোগে এবং রোগী তার ঘুমের প্রয়োজন নেই বলে মন্তব্য করে। তার মধ্যে হাম-বড়া ভাব লক্ষ করা যায়, মিতব্যয়িতা ও সহনশীলতার অভাব দেখা যায় এবং সহজেই উত্তেজিত হয়ে কলহ-বিবাদে লিপ্ত হয়ে থাকে।

(খ) মৃদু হর্ষোন্মত্ততা (Hypomanic episode): উপরোক্ত লক্ষণসমূহের কয়েকটি মৃদু মাত্রায় কোনো রোগীর মধ্যে স্বল্প সময়ের জন্য থাকলে তাকে মৃদু হর্ষোন্মত্ততা বা হাইপোম্যানিয়া বলে।

বিষন্নতা রোগ (Depressive disorder)

মানুষের মন ও আবেগ নিয়ত পরিবর্তনশীল। পরিবেশ ও পরিস্থিতির কারণে স্বাভাবিকভাবেই আবেগের পরিবর্তন হয়ে থাকে। বিষন্নতা একটি সাধারণ মানসিক ব্যাধি। পারিবারিক কিংবা ব্যক্তিগত জীবনের জটিলতা, জীবন-যাপনের প্রতিকূলতার কারণে কখনো কখনো মানুষ বিষন্ন হয়ে পড়ে। প্রিয়জনের সাথে বিচ্ছেদও মানুষকে বিষাদগ্রস্ত করে। সময়ের সাথে সাথে এই বিষন্নতাবোধ ধীরে ধীরে চলে যায়, কিন্তু যখন বিনাকারণে বা সামান্য কারণে বিষন্নতা আসে এবং দীর্ঘদিন ধরে থাকে তখন তাকে বিষন্নতা রোগ (Depressive disorder) বলা হয়।

রোগীর চোখেমুখে বিষাদের ছায়া দেখা যায়, কাজকর্মের প্রতি আগ্রহ থাকে না, অনিদ্রা ও খিদে কমে যায় – ফলে ক্লান্ত ও শক্তিহীন বোধ করে। রোগী নিজেকে অযোগ্য ও অপরাধী বলে ভাবতে তাকে এবং সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগে থাকে। কারো কারো মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা দেখা যায়। কেউ কেউ আত্মহত্যা করেও থাকে। সেইজন্য এই রোগ যথাসময়ে নির্ণয় করতে পারলে অনেক রোগীকে আত্মহত্যা থেকে রক্ষা করা যেতে পারে।

আবেগজনিত দ্বি-প্রান্তিক ব্যাধি (Bipolar disorder)

কেউ কেউ আনন্দ এবং বিষাদ উভয়ই বোধ করে থাকে। কোনো রোগীর মধ্যে পর্যায়ক্রমে এক বা একাধিক আনন্দ বা হর্ষ (Manic episode) এবং বিষন্নতা (Depressive disorder) দেখা দিলে তাকে হর্ষ-বিষাদোন্মত্ততা রোগ (Manic depressive psychosis) বলে। এই রোগকে মুখ্য দুই আবেগের (হর্ষ-বিষাদ) অস্বাভাবিকতার কারণে দ্বি-প্রান্তিক ব্যাধি বলা হয়ে থাকে।

বুদ্ধিবৈকল্য বা চিত্তভ্রংশ (Dementia)

স্নায়ুরোগের কারণে মানসিক সমস্যা দেখা দেয়। মস্তিষ্কের ক্রমাগত ক্ষয়হেতু এই রোগের উৎপত্তি ঘটে। এই রোগে বুদ্ধি, স্মরণশক্তি ও ব্যক্তিত্ব লোপ পায়। সাধারণত এই রোগ বয়স্কদের মধ্যে দেখা যায়।

লঘু মানসিক রোগ

উদ্বেগাধিক্য রোগ (Anxiety disorder)

এই রোগের লক্ষণ হলো সবসময় অস্বস্তি বোধ করা, অহেতুক উৎকণ্ঠা এবং কোনো প্রকার বিপদের সম্ভাবনা দেখলেই উদ্বেগাচ্ছন্ন হয়ে পড়া। উদ্বেগের ফলে বুক ধড়ফড় করা, ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস পড়া, স্মরণশক্তি কমে যাচ্ছে বলে মনে করা, ঘুম কম হওয়া এবং দুঃস্বপ্ন দেখে চিৎকার করা, ক্ষুধা কমে যাওয়া, দূর্বল বোধ করা, শরীরে ঘাম হওয়া এবং মাংসপেশী শক্ত হয়ে আসা। অনেকের মধ্যে দিনের পর দিন উপরে বর্ণিত লক্ষণগুলো যদি খন্ড খন্ড আকারে অতি প্রকট হয়ে সপ্তাহে একবার বা মাসে একাধিকবার দেখা দেয় তবে তাকে 'প্যানিক এ্যাটাক' বা 'প্যানিক ডিজঅর্ডার' বলা হয়।

সাধারণ বিষন্নতা (Depression)

এধরনের বিষন্নতা একটি সাধারণ মানসিক ব্যাধি। একটু লক্ষ করলেই এই ধরনের রোগীকে সনাক্ত করা যায়। সাধারণত মধ্য-বয়সে অর্থাৎ ৩০ থেকে ৪৫ বছর বয়সেই এই রোগ অধিক দেখা যায়। মহিলাদের মধ্যে এই রোগ পুরুষের চাইতে দ্বিগুণ হয়ে থাকে। বংশগতভাবে এই রোগের আধিক্য বাড়তে দেখা যায়। রোগীর মুখে বিমর্ষতা বা বিষাদের ছাপ দেখা যায়। তার কাজকর্মের প্রতি আগ্রহ কিংবা কাজে আনন্দ থাকে না। তার কোনোকিছু চিন্তা করা কিংবা মনোযোগ দেওয়ার ক্ষমতা কমে যায়। বিষন্নতার পরিমাণ খুব বেশি আকারে প্রকাশ পেলে তাকে গুরুতর মানসিক ব্যাধি বলা যায় – যা পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে বর্ণিত হলো।

মূর্ছারোগ (Hysteria)

মূর্ছা বা হিস্টিরিয়া রোগ এক ধরনের মানসিক রোগ। শতকরা ০.৩ থেকে ০.৬ জন মহিলা এই রোগে ভুগে থাকে। সাধারণত ১৫ থেকে ৪০ বয়সের মহিলার হিস্টিরিয়া হয়ে থাকে। মানসিক দুঃশ্চিন্তাই এই রোগের প্রধান কারণ। রোগী যখন তার দুঃশ্চিন্তার কথা কারো কাছে প্রকাশ করতে না পারে অথবা সমস্যার সমাধান বেছে নিতে না পারে তখন শারীরিক বা মানসিক উপসর্গ প্রকাশ করার মাধ্যমে দুঃশ্চিন্তা লাঘবের বা সাময়িকভাবে সমস্যা সমাধানের প্রয়াস পায় এবং সেইসাথে পরিবার ও সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যও চেষ্টা করে। এই ধরনের রোগীদের অনেকের ব্যক্তিত্বে অধিক আবেগ-প্রবণতা, পরনির্ভরতা ও নাটকীয়তা লক্ষ করা যায়। রোগের উপসর্গগুলো হলো: হাত-পা অবশ হয়ে-যাওয়া, অনুভূতি কমে-যাওয়া, কথা বলতে না-পারা, কানে না-শোনা, চোখে না-দেখা, পেটে ব্যথা, খিচুনি ও অজ্ঞান হয়ে যাওয়া। একে কনভার্শন ডিজঅর্ডার (Conversion disorder) বলে। মানসিক লক্ষণ, যেমন: স্মৃতিভ্রম, অচেনা স্থানে চলে-যাওয়া, রাতে ঘুমের মধ্যে হাঁটা প্রভৃতিকে 'ডিসোসিয়েটেড' ডিজঅর্ডার (Dissociated disorder) বলে। রোগ শুরু হওয়ার পূর্বে কোনো ব্যক্তিগত, পারিবারিক বা সামাজিক দ্বন্দ্বের ঘটনা ঘটে থাকে। হিস্টিরিয়া যেকোনো রোগের উপসর্গ নিয়ে আসতে পারে, তবে সচরাচর মৃগী রোগের খিচুনি ও হিস্টিরিয়ার উপসর্গের প্রকৃতিগত মিলের কারণে প্রকৃত রোগ নির্ণয় অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়ে।

আমাদের দেশে, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে, জ্বীনে-ধরা, ভূতে-ধরা, পরীর আছর এই সমস্ত অভিযোগ নিয়ে এধরনের রোগীকে পীর, ফকির, ওঝা ও দরবেশের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। আসলে এরা অধিকাংশই হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রোগী। এদেরকে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা করানো উচিত। রোগীর আত্মীয়-স্বজনকে বুঝাতে হবে হিস্টিরিয়া একটি মানসিক রোগ এবং উপযুক্ত চিকিৎসার মাধ্যমে এই রোগ ভালো করা সম্ভব।

বাধ্যতাধর্মী মানসিক ব্যাধি (Obsessive compulsive disorder)

চিন্তা-বাতিক (Rumination): এধরনের রোগী মন থেকে চিন্তা দূর করতে পারে না। এই চিন্তা অস্বস্তিকর, এমনকি বেদনাদায়ক হতে পারে। রোগী নিজেও জানে এই চিন্তা অর্থহীন; তবুও তা মন থেকে দূর করতে পারে না।

কর্ম-বাতিক (Rituals): এধরনের রোগী কোনো একটা কাজ করা থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারে না; একই কাজ অনেক সময় ধরে করতে থাকে, যেমন: ঘন্টার পর ঘন্টা ঘর মুছে চলে বা কাপড় ধূয়ে চলে, ইত্যাদি।

আচরণগত চিকিৎসার মাধ্যমে এই ধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়। যে বিশেষ কাজটি রোগী না করে থাকতে পারে না তাকে সেই কাজ করা থেকে বিরত রাখতে হবে। প্রথম দিকে কিছুটা অসুবিধা হলেও ধৈর্যের সাথে এই চিকিৎসার ফলে রোগী ভালো ফল লাভ করে।

অহেতুক ভীতি রোগ (Phobic disorder): এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিরা কোলাহলময় অথবা নির্জন স্থানে, উঁচু জায়গায় (পাহাড় বা বাড়ির ছাদে), একা দূরে কোথাও চলাফেরা করতে ভয় পায়। অনেক রোগী তেলাপোকা, কেঁচো, টিকটিকি, কল্পিত ভূত-প্রেত ইত্যাদিকেও প্রচন্ড ভয় পায়। অনেকের আবার রোগভীতি থাকে, যেমন হৃদরোগ, ক্যান্সার ও এইডস ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হয়েছে সন্দেহে ভয় পায়।

এই অহেতুক ভীতির রোগীরা নিজেরাও জানে এবং বিশ্বাস করে যে তার এই ভয় অহেতুক এবং অস্বাভাবিক, কিন্তু ভয়ের বস্তু ও স্থানের নিকটস্থ হলে ভয় বা উদ্বেগাধিক্য বাড়ে এবং ওই স্থান ও বস্তুকে এড়িয়ে চলে।

এধরনের মানসিক রোগীকে বার বার আশ্বস্ত করা, ভীতিপ্রদ বস্তুর কাছে ও তার ভয়ের স্থানে আস্তে আস্তে নিয়ে গিয়ে ভয় ভাঙ্গাতে হয়। ভয়জনিত কারণে তার উৎকণ্ঠা বাড়ে। সেজন্য আচরণগত চিকিৎসাই এই রোগ উপশমের প্রধান উপায়।

অন্যান্য মানসিক রোগ

মৃগী রোগ (Epilepsy)

মৃগী রোগ একটি গুরুতর স্নায়ুরোগ। মস্তিষ্কের বৈদ্যুতিক কার্যক্রমের অস্বাভাবিকতার কারণে মৃগী রোগীর খিঁচুনি হয় এবং রোগী অজ্ঞান হয়ে পড়ে। হাজারে ৪-৬ জন মানুষের এই রোগ হয়ে থাকে। খিঁচুনি হঠাৎ করেই হয় এবং তা যেকোনো জায়গায় হতে পারে। রোগী মাটিতে পড়ে যায় এবং সাথে সাথে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। আবার অনেক সময় কান্নার মত চিৎকার বা গোঙ্গানির মত শব্দ করার সঙ্গে রোগের আক্রমণ ঘটে। রোগীর মুখমন্ডল নীলবর্ণ ধারণ করে এবং তারপরেই হাত-পায়ের ছন্দময় স্পন্দন শুরু হয়। কোনো কোনো সময় রোগী তার কাপড়ে প্রস্রাব-পায়খানাও করে ফেলতে পারে। জিহ্বা কেটে রক্ত বের হতে পারে, মুখ দিয়ে সাদা অথবা রক্তমিশ্রিত ফেনা বের হতে পারে। রোগের আক্রমণকাল কেটে গেলে খিঁচুনির সময় কী কী ঘটেছে তা মনে করতে পারে না। মৃগী রোগ যেকোনো বয়সে হতে পারে। খিঁচুনি যদি ঝুঁকিপূর্ণ জায়গায়, যেমন আগুনের নিকটে, জলাশয়ের কাছে, চলমান গাড়ির কাছে অথবা উঁচুস্থানে হয় তাহলে রোগীর মৃত্যুও হতে পারে। মৃগী রোগীর চিকিৎসার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে খিঁচুনি নিয়ন্ত্রণ ও ব্যক্তিগত ক্ষতি কমানো, সমাজে প্রচলিত ভুল বিশ্বাসকে ঠেকানো এবং রোগীর ব্যবহারিক ও সামাজিক জীবনকে উন্নত করা। হিস্টিরিয়ার সাথে মৃগী রোগের প্রধান তফাৎ হচ্ছে: হিস্টিরিয়া রোগী চেতনা হারায় না এবং খিঁচুনি ঘুমের মধ্যে হয় না, কিন্তু মৃগী রোগের খিঁচুনি ঘুমের মধ্যেও হতে পারে।

শিশু-কিশোরদের মানসিক রোগ

শিশুরা নিজেদের সমস্যা বুঝতে ও তা প্রকাশ করতে পারে না। তারা তাদের সমস্যা বুঝা বা জানার জন্য পিতা-মাতা বা অভিভাবকদের ওপর নির্ভর করে। শিশুদের স্বাভাবিক আচরণ নির্ভর করে বয়সের ওপর। শিশুর বয়স বাড়ার সাথে তার দৈহিক ও মানসিক পরিবর্তন ঘটে থাকে। এই পরিবর্তন যদি দ্রুততর হয় তবে নানারকম মানসিক সমস্যা দেখা দেয়। কিছু কিছু মানসিক সমস্যা শৈশবে শুরু হয়ে কৈশোরকাল পর্যন্ত চলতে পারে। আবার পূর্ণ বয়স্কদের কিছু রোগ কৈশোরেই শুরু হয়ে থাকে। বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে: কোনো না কোনো সময়ে শতকরা ১০ ভাগ শিশু মানসিক সমস্যায় আক্রান্ত হয়ে থাকে।

শিশুদের সাধারণ মানসিক রোগ বা সমস্যাগুলো নিম্নরূপ:

১. রাতে বিছানায় পেসাব করা
২. অতিকর্মতৎপরতা রোগ
৩. অবাঞ্ছিত আচরণ

রাতে বিছানায় পেসাব করা

রাতে বিছানায় মূত্র ত্যাগ অনেক সময় সমস্যা হিসেবে দেখা দেয় এবং অভিভাবকগণ অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েন। অনেক সময় এই জন্য শিশুকে শাস্তি দেয়া হয়ে থাকে। তার ওপর আবার অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবও এই নিয়ে হাসি-মস্করা করে তার জীবন অতীষ্ট করে তোলে।

প্রতিকার: অভিভাবকদের এতে উদ্বিগ্ন না হয়ে অবশ্যই শিশুর এই সমস্যার কারণ খুঁজে দেখতে হবে। পারিবারিক চিকিৎসকের সাহায্যে মূত্রনালীতে কোনো প্রকার সংক্রমণ আছে কি না অথবা দৈহিক কোনো কারণ আছে কি না তা জানতে হবে।

- রাতে এমন খাবার দিতে হবে যাতে পানির পরিমাণ কম থাকে।
- বিছানায় যাওয়ার আগে মূত্র ত্যাগ করিয়ে নিতে হবে। সেই সাথে স্নেহ-মমতায় শিশুকে বুঝাতে হবে।
- সম্ভব হলে রাতেও দুই একবার মূত্র ত্যাগ করিয়ে আনতে হবে।

বিছানায় মূত্র ত্যাগ না করলে তাকে পুরস্কৃত করা হবে – এই বলে তাকে উৎসাহ প্রদান করতে হবে যাতে সে অভ্যাস পরিবর্তন করতে নিজ থেকে সচেষ্ট হয়।

অতিকর্মতৎপরতা

শিশুদের অতিকর্মতৎপরতা খুব সহজেই চিহ্নিত করা যায়। তারা কখনো এক মুহূর্তের জন্যও চুপ করে বসে থাকতে পারে না। তারা সর্বক্ষণ কিছু না কিছু করতে থাকে, এমনকি অনেক সময় ধ্বংসাত্মক কাজও করে ফেলে। কোনো কারণে মস্তিস্কে অল্প ক্ষতি হলে এই অবস্থা হতে পারে। এই অস্বাভাবিক কর্মতৎপরতা কমানোর জন্য বেশ কয়েকটি ওষুধও আছে। চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ তাই অপরিহার্য।

অবাঞ্ছিত আচরণ

শিশু হঠাৎ করে কিছু অসামাজিক আচরণ শুরু করে। যার ফলে পরিবার ও স্কুলের সহপাঠীরাও বিরক্ত বোধ করে থাকে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে:

- মিথ্যা কথা বলা
- চুরি করা
- অভদ্র বা অকথ্য ভাষায় কথা বলা ও কলহ-বিবাদে লিপ্ত হওয়া
- জিনিষপত্রের ক্ষতি সাধন করা
- স্কুলে না-যাওয়া/স্কুল থেকে পালানো
- অবাধ্যতা
- যৌন অপরাধ
- দলবদ্ধভাবে অপরাধ করা ইত্যাদি

উপসংহার

বাংলাদেশে যত প্রকার স্বাস্থ্য সমস্যা আছে তার মধ্যে মানসিক রোগ সম্পর্কে জনসাধারণের ধারণা খুবই সামান্য। এর প্রধান কারণ শিক্ষার অভাব ও অজ্ঞতা। যুগ যুগ ধরে এদেশের মানুষ কবিরাজ, পীর, ফকির, সাধু, তান্ত্রিক ও মাজারশরীফের শরণাপন্ন হয়ে থাকেন। ফলে রোগীর অবস্থা ভালোর চাইতে খারাপ হয়ে থাকে। রোগ হলে তার চিকিৎসা আছে। বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে আধুনিক চিকিৎসার মাধ্যমে এসমস্ত রোগ দূর করা সম্ভব। সবসময় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে যেতে হবে তা নয়। বেশিরভাগ রোগীকেই পার্শ্ববর্তী উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসা দেওয়া সম্ভব। আপনার শিশু বা রোগীকে ভালো খাবার ও স্নেহ-ভালবাসা দিন। দূষণমুক্ত পরিবেশ গড়ে তুলুন। শিক্ষার সুব্যবস্থা করুন। দেখবেন সে সুস্থ হয়েছে। সুখী পরিবারেই সুস্থ শিশু বেড়ে ওঠে।

বুকের দুধ

(৮-এর পাতার পর)

মায়েদের উপকার

- শিশুকে বুকের দুধ দিলে জরায়ু খুব দ্রুত গর্ভপূর্ববর্তী অবস্থায় ফিরে যায় এবং মায়ের রক্তস্রাবের পরিমাণ কমে। এর ফলে মা রক্তাল্পতার হাত থেকে রক্ষা পান। তাছাড়া পরবর্তী মাসিক বিলম্বিত হওয়ায় মায়ের পরবর্তী গর্ভসঞ্চার দেরিতে ঘটে।
- শিশুকে বুকের দুধ দেন এমন মায়েদের স্তনের ক্যান্সার এবং জরায়ুর ক্যান্সার হবার আশংকা কম থাকে।
- বুকের দুধ খাওয়ালে মা দ্রুত স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ফিরে পেতে পারেন।
- বুকের দুধ দেওয়ার মাধ্যমে মা ও শিশুর মানসিক বন্ধন দৃঢ় হয়।

অর্থনৈতিক সুবিধা

- মায়ের দুধ কেবল শিশুখাদ্য কেনার টাকা এবং বোতলের-দুধ-খাওয়া শিশুর দেখা-শোনার সময় বাঁচায় না, শিশু কম অসুস্থ হয় বলে পরোক্ষভাবে অর্থেরও সাশ্রয় হয়।
- কর্মস্থলে মা শিশুকে বুকের দুধ দিতে পারলে কাজে তার অনুপস্থিতির হার কমে যায়। এর ফলে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়।

পরিবারের লাভ

- শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ালে বোতলে দুধ খাওয়ানোর ঝামেলা এবং শিশুর অসুস্থতাজনিত ঝামেলা ও চিকিৎসা খরচ থেকে পরিবারের সদস্যগণ রক্ষা পায়।
- শিশুকে বুকের দুধ দেওয়া হলে শিশুর খাদ্যের নিশ্চয়তা থাকে–যা পরিবারের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জনে সহায়ক হয়।

পরিবেশের উপকার

- বোতলে দুধ খাওয়ালে খালি বাক্স, কৌটা, টিন, বোতল, রাবারের নিপল ইত্যাদি পরিবেশকে নষ্ট করে। বুকের দুধ খাওয়ালে এসব জঞ্জাল পরিবেশকে নষ্ট করতে পারে না। এভাবে পরিবেশ নিরাপদ থাকলে সকলেই আমরা উপকৃত হবো।

দেশের লাভ

শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ালে প্রতিবছর প্রচুর অর্থের বিনিময়ে শিশুখাদ্য ক্রয়ের খরচ থেকে দেশ রক্ষা পেতে পারে। হিসাব করে এ-কথা প্রতিপন্ন করা যায়: বুকের দুধ শ্রেষ্ঠ পুঁজি। একটি দুই মাসের বাচ্চা–যার ওজন ৪-৫ কেজি–টিনের দুধে মাসে তার জন্য কত খরচ হয় তার একটি হিসাব নিম্নরূপ:

বর্তমানে বাজারে ল্যাকটোজেন-এর যে টিন পাওয়া সে-টিনে ৪৫০ গ্রাম গুঁড়া দুধ থাকে; ১ চামচে ৬ গ্রাম গুঁড়া দুধ ধরে। অতএব ১ টিনে ৪৫০ ÷ ৬ = ৭৫ চামচ দুধ তৈরি হবে। কোনো শিশু যদি ১.৫ আউন্স দুধ ২ ঘন্টা পর পর খায় তাহলে সারাদিন ২৪ ÷ ২ = ১২ বার খাওয়াতে হবে। ১ আউন্স দুধ বানাতে ১ চামচ গুঁড়া দুধ লাগে।

অতএব সে প্রতিদিন ১.৫ × ১২ = ১৮ চামচ দুধ খাবে। এক টিনে থাকে ৭৫ চামচ দুধ, আর ১ দিনে মোট ১৮ চামচ দুধ লাগলে এক টিনে ৭৫ ÷ ১৮ - ৪.১ দিন যাবে – অর্থাৎ প্রতিমাসে তার ৭.৫ টিন লাগবে।

১ টিনের দাম ১২৫ থেকে ১৩০ টাকা। যদি শিশুটি শুধুমাত্র বুকের দুধ খায় তবে মাসে শুধু দুধ বাবদ ৯৭৫ টাকা খরচ বাঁচবে। তাছাড়াও বোতল, ব্রাশ, ফ্লাস্ক, জ্বালানী-খরচ ইত্যাদির সঙ্গে ঝামেলা থেকেও রেহাই পাওয়া যাবে।

অতএব বুকের দুধ সবার জন্য, বিশেষ করে আমাদের মত দরিদ্র সমাজের মানুষের জন্য, নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ পুঁজি।

স্বাস্থ্য কুইজ-২২

১. কী কী অবস্থায় শিশুর শ্বাসতন্ত্রের হঠাৎ সংক্রমণের (ARI) সম্ভাবনা বেড়ে যায়?

২. বিশোধন বা Decontamination কী এবং কিভাবে করা হয়? কোন্ কোন্ গুরুত্বপূর্ণ জীবাণু বিশোধন দ্বারা প্রতিরোধ করা যায়?

৩. যৌনরোগে আক্রান্ত হলে HIV ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি কতগুণ বেড়ে যায় এবং কেন?

৪. পাঁচটি নিরাপদ যৌন-অভ্যাস কী কী?

৫. ফোঁড়ার দু'টি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ উল্লেখ করুন। শরীরের কোন্ কোন্ জায়গায় ফোঁড়া হলে রোগীকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাবার পরামর্শ দেওয়া প্রয়োজন?

[উত্তর আমাদের কাছে অবশ্যই ১০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে পৌঁছাতে হবে]

জেনে রাখা ভালো

কোথায় কোথায় এইডস পরীক্ষা করা হয়

- ভাইরোলজি বিভাগ
  বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, শাহবাগ, ঢাকা
- মাইক্রোবায়োলজি ল্যাবরেটরি
  জনস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান (আইপিএইচ), মহাখালী, ঢাকা
- আর্মড ফোর্সেস প্যাথলজি ল্যাবরেটরি (এপিএল)
  ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা
- রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর)
  মহাখালী, ঢাকা
  (স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পার্শ্বে পুরাতন ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ বিল্ডিং)
- প্যাথলজি বিভাগ
  এমএজি ওসমানি মেডিকেল কলেজ, সিলেট
- প্যাথলজি বিভাগ
  চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ, চট্টগ্রাম
- প্যাথলজি বিভাগ
  ২৫০ শয্যা-বিশিষ্ট হাসপাতাল, খুলনা

এসব স্থানে এইডস পরীক্ষা করতে কোনো টাকা লাগে না। যে কেউ তার নাম, ঠিকানা এবং পরিচিতি না দিয়ে শুধুমাত্র কোড নম্বরের ভিত্তিতে পরীক্ষা করাতে পারেন। ফলাফল ব্যক্তিগতভাবে অথবা টেলিফোনের মাধ্যমে জানা যায়। এতে আপনার গোপনীয়তা বজায় থাকবে—সেই সঙ্গে পরিবার-পরিজন ও বন্ধু-বান্ধবকে নিরাপদ রাখতে পারবেন।

স্বাস্থ্য কুইজ-২১ এর উত্তর

১. মারাত্মক নিউমোনিয়ায় ০-২ মাস বয়সের শিশুর শ্বাস-প্রশ্বাস প্রতি মিনিটে ৬০ বা তারও বেশি।

২. খাদ্যে ক্যালরির স্বল্পতার কারণে শিশুরা পুষ্টিহীনতায় ভোগে। ফলে দেহের মাংসপেশী শুকিয়ে যায় ও ত্বকের চর্বিশূন্যতা দেখা দেয়। এধরনের পুষ্টিহীন অবস্থাকে ম্যারাসমাস রোগ বলে। এ-রোগের উপসর্গ ও লক্ষণ:

- অত্যধিক ওজন হ্রাস
- দেহ কৃষকায় হওয়া
- ত্বক চর্বিশূন্য হওয়া
- রক্তাল্পতা
- হজমের অসুবিধা

৩. যেসব সক্ষম দম্পতি বর্তমানে জন্মবিরতির ইচ্ছা পোষণ করছেন অথচ বর্তমানে কোনো সন্তান নেই তাদের জন্য কনডম ও খাবার বড়ি গ্রহণযোগ্য।

৪. শিশুর স্বাভাবিক জন্ম-ওজন ছেলে হলে ৩.৩ কেজি, মেয়ে হলে ৩.২ কেজি। জন্ম-ওজন যদি ২.৫ কেজির কম হয় তবে তাকে কম-ওজনের (Low-birth-weight) শিশু বলা হয়।

৫. পাতলা পায়খানা বা কলেরা হলে রোগীর শরীর থেকে প্রচুর পানি ও লবণ বের হয়ে যায়। লবণ, বিশেষ করে বাইকার্বনেট, বের হয়ে যাওয়ায় রক্তের অম্লত্ব বেড়ে যায় এবং এই কারণে বমি হয়। এ-অবস্থাকে এসিডোসিস বলে।

পানিশূন্যতার মাত্রা অনুযায়ী রোগীকে অন্তঃশিরা স্যালাইন বা খাবার স্যালাইন দিয়ে রক্তের অম্লত্বকে স্বাভাবিক মাত্রায় ফিরিয়ে আনলেই বমি বন্ধ করা যায়।

এক্ষেত্রে বমি বন্ধ করার জন্য কোনোরকম ওষুধ রোগীকে খাওয়ানো উচিৎ নয়, কেননা এসময় বমি বন্ধ করার ওষুধ খেলে বরং রোগীর ক্ষতি হয়। একমাত্র স্যালাইন খাওয়ালেই রোগীর বমি বন্ধ হবে। কলেরার চিকিৎসার জন্য টেট্রাসাইক্লিন বা এরিথ্রোমাইসিন (প্রয়োজনবোধে) অবশ্যই দেওয়া হয়। তবে এই ওষুধ এসিডোসিস বা বমি বন্ধের জন্য নয়।

সঠিক উত্তরদাতা

১. *নিপা চৌধুরী, প্রযত্নে রফিকুল আলম চৌধুরী, ভি-এইড রোড, মুন্সীপাড়া, গাইবান্ধা*

২. *দুলাল চন্দ্র পন্ডিত, পরিসংখ্যানবিদ, থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, নিকলী, কিশোরগঞ্জ ২৩০০*

গর্ভবতী মাকে
বাড়তি পুষ্টিকর খাবার দিন

বুকের দুধ শ্রেষ্ঠ পুঁজি

আনোয়ারা হায়দার

শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ানো একটা পুরানো এবং প্রচলিত প্রথা হওয়া সত্ত্বেও এক পুষ্টি-জরীপে দেখা গেছে: স্তন্যদান করলে দৈহিক সৌন্দর্যহানি ঘটতে পারে – এই ধারণায় ঢাকা শহরে ৩৪.৩%, খুলনা শহর এলাকায় ৩২.৫% এবং ঢাকা শহরতলীতে ২৩.৩% মা শিশুকে দুধ খাওয়ান না। পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের পুষ্টি-জরীপে দেখা গেছে: নিজ অসুস্থতার কারণে ঢাকা শহর এলাকার ১৮.৫%, খুলনা শহর এলাকার ২৭.৯% এবং ঢাকা শহরতলীর ১৮.৩% মা শিশুকে স্তন্যদান করেন না। তবে এসমস্ত মায়েরা তাদের অসুস্থতার ধরন সম্পর্কে কোনোরকম সদুত্তর দিতে পারেন নি।

বুকের দুধের স্বল্পতার কারণে ঢাকা শহরে ১৫.৭%, খুলনায় ২০.৯% এবং ঢাকা শহরতলীর ১৫% মা শিশুকে দুধ খাওয়াতে পারেন নি। একেবারেই দুধ হয় নি এজন্য ঢাকা ও খুলনা শহরের যথাক্রমে ৪৫.৫% এবং ৬৩.৬% মা দুধ খাওয়াতে পারেন না। কিন্তু তা মায়ের ভ্রান্ত ধারণা ও আস্থার অভাবের জন্য হয়ে থাকে। সাধারণত একজন মা তার শিশুকে সব অবস্থাতেই পুরোপুরিভাবে স্তন্যদান করতে সক্ষম যদি তিনি মানসিকভাবে তৈরি থাকেন। শিশু যখন দুধের বোঁটা চোষে তখন মায়ের শরীরে যে অনুভূতি বা আবেগ সৃষ্টি হয়, তার সংকেত মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে হাইপোথ্যালামাসে পৌঁছায় এবং পিটুইটারি গ্রন্থির সম্মুখভাগ থেকে প্রোল্যাকটিন নামক হরমোন রক্তে ক্ষরিত হয়ে স্তনে দুধ তৈরি হয়। একই সময়ে পিটুইটারি গ্রন্থির পিছনভাগ থেকে 'অক্সিটোসিন' নামক হরমোন রক্তে ক্ষরিত হয়ে দুগ্ধ-গ্রন্থির চারপাশের মাংসপেশীর ওপরে চাপ সৃষ্টি করে। ফলে দুধ নালী থেকে বের হয়ে শিশুর মুখে আসে। কাজেই শিশুকে যত বেশি করে দুধ চুষানো হবে তত বেশি দুধ তৈরি হবে।

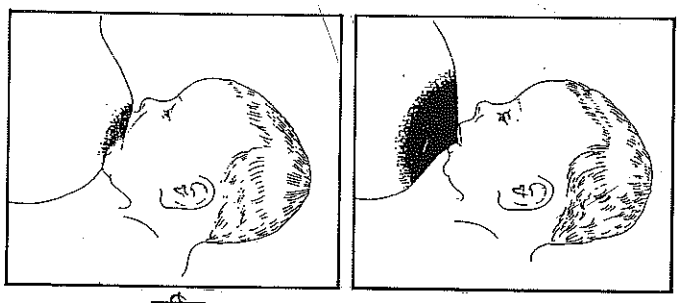

সঠিক ভুল

অনেক সময় স্তন্যদান করলে দুধের বোঁটা ফেটে গিয়ে ঘায়ের মত হয়। শুধুমাত্র স্তনের বোঁটা মুখে নিয়ে চুষলে এমন হয়। তাই বড় করে শিশুর মুখ খুলে বোঁটার চারপাশের কালো অংশ (এ্যারিওলা)সহ যতটা সম্ভব শিশুর মুখে দেওয়া উচিত।

কারো কারো দুধের বোঁটা খুব ছোট থাকে ও ভিতরের দিকে ঢুকানো থাকে। তাদের বেলায় গর্ভধারণের পর প্রতিদিন একবার করে স্তনের কালো অংশে একটু তেল মেখে দুধের বোঁটা বারবার টানা উচিত, তাতে স্তনের বোঁটা সুস্পষ্ট হবে। দুধ খাওয়ানোর প্রথম দিকে অনেক সময় স্তনে দুধ জ'মে শক্ত হয়ে যাওয়ার ফলে বেশ ব্যথা হয়। এ-অবস্থায় জ্বরও হতে পারে। তখন শিশুকে দুধ খাওয়ানো বন্ধ না করে গরম পানিতে তুলা ভিজিয়ে স্তনের চারিদিকে একটু সেঁক দিয়ে হাতে চাপ দিয়ে বা পাম্পের সাহায্যে গালানো দুধ বাটি বা চামচে করে শিশুকে খাওয়ানো যেতে পারে।

কর্মজীবী মহিলাদের যদি কর্মক্ষেত্রে বাচ্চা রাখার ব্যবস্থা করা যায় তাহলে পুরাপুরি দুধ খাওয়ানো সম্ভব। যদি তা না থাকে তাহলে দুপুরের খাবারের জন্য যে সময় বরাদ্দ থাকে তার ফাঁকে বাড়ি যাওয়ার অনুমতি প্রদান করতে হবে। তাহলে বাসায় এসে মা শিশুকে দুধ খাইয়ে কিছু দুধ গালিয়ে রেখে যেতে পারেন। সেটাও যদি সম্ভব না হয় তাহলে কর্মক্ষেত্রেই দুই তিনবার দুধ গালিয়ে কোনো পরিস্কার পাত্রে রেখে দেওয়া যায়। গালানো দুধ স্বাভাবিক তাপমাত্রায় ৮ ঘন্টা ভালো থাকে। এই দুধ বাচ্চার জন্য পাঠিয়ে দেওয়া যায়। তার ফলে দুধের ধারাও ভালো থাকে, দুধ জ'মে স্তন শক্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও থাকে না।

শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ালে একদিকে যেমন শিশুর উপকার হয়, তেমনি মায়ের নিজের, পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থার তথা দেশের সার্বিক অবস্থারও উন্নতি ঘটে।

শিশুর উপকার

- মায়ের শালদুধ শিশুর জীবনের প্রথম টিকা হিসেবে কাজ করে, কারণ এতে থাকে ডায়রিয়া, শ্বাসতন্ত্রের সাধারণ রোগ ও অন্যান্য রোগের প্রতিরোধক উপাদান।
- শুধুমাত্র বুকের দুধই শিশুর প্রথম পাঁচ মাস বয়স পর্যন্ত সকল প্রকার পুষ্টি যোগায় এবং পরবর্তী সময়ে তার শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের বিকাশে সহায়ক হয়।
- মায়ের দুধ পানকারী শিশু বোতলের দুধ-পান-করা শিশুর চেয়ে স্বাস্থ্যবান হয় এবং অধিকতর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা লাভ করে। ডায়াবেটিস, হৃদরোগ ও উচ্চ রক্তচাপও এসব শিশুদের বেলায় কম দেখা যায়।
- গবেষণায় দেখা গেছে: শিশুকে মায়ের দুধ পান করানো হলে সারাবিশ্বে প্রতিবছর ডায়রিয়া ও নিউমোনিয়ায় মৃত্যুবরণকারী ১৫ লাখ শিশুর জীবন বাঁচানো সম্ভব হতো।

(৬-এর পাতায় দেখুন)

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান উপদেষ্টা ঃ অধ্যাপক জর্জ ফুশ; সম্পাদক ঃ ডাঃ ফকির আঞ্জুমান আরা; ব্যবস্থাপনা সম্পাদক ঃ এম. শামসুল ইসলাম খান
সদস্য ঃ ইউসুফ হাসান, মুহম্মদ মুজিবর রহমান, ডাঃ মহসীন আহমেদ, ডাঃ হাসান আশরাফ ও এম. এ. রহীম; ডিজাইন ঃ আসেম আনসারী
প্রকাশক ঃ আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ (আইসিডিডিআর,বি) জিপিও বক্স ১২৮, ঢাকা ১০০০। ফোন ঃ ৮৭১৭৫১-৬০; ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৮৮৩১১৬
টেলেক্স ঃ ৬৭৫৬১২ আইসিডিডি বি.জে.; ই-মেইল ঃ msik@icddrb.org

মুদ্রণে ঃ ব্র্যাক প্রিন্টার্স বাংলাদেশ